Belles-Lettre 2023, Vol. 1, pp. 211-220

উদ্যোগপতি বাঙালি : অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দী

ড. অচিন্ত্য দে

যেকোন জাতির বিকাশ বা উন্নতির ক্ষেত্রে মূল চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করে অর্থনৈতিক অবস্থা। অর্থ ছাড়া নিজেকে সার্বিক ভাবে প্রকাশ করা অসম্ভব। ভারতবর্ষীয় আর্থসামাজিক ব্যবস্থা এবং অবস্থার পরিপেক্ষিতে বাঙালি অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল জাতি। বাঙালির বাৎসরিক গড় আয় গুজরাটী, মারাঠী, মাড়োয়ারী, তামিল, তেলেগু, কন্নর ইত্যাদি জাতির থেকে কম। এর এক কারণ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে অর্থ উৎপাদনের বিষয়ে মূল চালকের জায়গাতে বাঙালি প্রায় নেই। দেশের প্রথম সারির পুঁজিপতিদের তালিকাতে বাঙালি আসবে না। সারা দেশে তেমন বড় কোন বাঙালি ব্যাপারী খুঁজে প্রায় পাওয়া যাবে না। এমনকি বাংলারই বড় শহরগুলিতে যে সকল ব্যাবসায়ী প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেখানেও অবাঙলির বাড়বাড়ন্ত। বাঙালি সেখানে মাড়োয়ারী, গুজরাটী ফার্মগুলিতে নিষ্ঠাবান কর্মচারী হয়েই ধন্য। কম-বেশী নয় কোটি সন্তানে সমৃদ্ধ ভারতবর্ষীয় এই জনজাতি অর্থের নিরিখে পিছিয়ে পড়া শ্রেনি হিসাবে উপেক্ষিত এবং উপহাস্য।

অথচ অবস্থাটা চিরকাল এরকম ছিল এমন নয়। এই বঙ্গেও বড় ব্যাবসাদার ছিলেন। তাদের সামাজিক প্রতিপত্তিও ছিল যথেষ্ট। তা নাহলে চাঁদ সওদাগর, সাধু বণিক, ধনপতি সওদাগর মধ্যযুগের কাব্যে সমাজপতিরূপে গণ্য হতেন না। অথবা আলিবর্দী খাঁর নবাবী মহালেও গুরুত্ত্ব থাকতো না উমের চাঁদ, জগৎশেঠ দের। এক কালে বাংলার বয়ন শিল্প নিজগুনে খ্যাতি এবং বাজার পেয়েছিল এশিয়া এবং ইউরোপে। এর ধারক এবং বাহক বাঙালি উদ্যগপতিগণ ছিলেন নিশ্চয়ই। তবে সেইসব ইতিহাস মূলত অষ্টাদশ শতকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তার পরে গঙ্গা দিয়ে বয়ে গিয়েছে অনেক জল। শিল্প বিপ্লবের নিশান উড়িয়ে বাংলা তথা ভারতবর্ষে আবির্ভূত হয়েছে ইউরোপীয় বণিক সমাজ। পতন ঘটেছে বঙ্গীয় নবাবী শক্তির। প্রশাসনের দখল এসেছে ইংরেজের হাতে। তবে রাজদন্ড ছিল তাদের উপলক্ষ্য মাত্র। মূল উদ্দেশ্য ব্যাবসা আর মুনাফা।

....

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ।

সুতরাং দখল নিতে হবে বাজার। এর জন্য আগে এদেশের নিজস্ব হস্ত শিল্পগুলি দুর্বল করা চাই। তাই দেশীয় ব্যাবসার উপরে চাপিয়ে দেওয়া হল অতিরিক্ত শুল্ক। দেশীয় দ্রব্য বাজারজাত করণের ক্ষেত্রে তৈরী করা হল কৌশলী প্রতিবন্ধকতা। পাশাপাশি গঙ্গার পূর্ব কূলে ভিড়তে লাগল পশ্চিমী শিল্পজাত সম্ভার। স্বল্প শুল্কের সুবিধা নিয়ে সেগুলি ভারতের বাজারে বিস্তার করল একচ্ছত্র আধিপত্য। শিল্পবিপ্লবের চারণভূমিতে অতি উৎপাদনের ভারে ন্যুব্জ ইউরোপকে ভারমুক্ত করার এ এক নির্মম অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার বাঁধনে আটকে গিয়েছিল বাংলার ঐতিহ্যবাহী শিল্প প্রবাহ। এবং স্তিমিত হয়ে গিয়েছিলো বাঙালির নিজস্ব বানিজ্য উদ্যোগ।

কিন্তু অর্থনীতির চরিত্র অনেকটা সমতলে প্রবাহিত নদীর স্রোতের মতন। যার একূল ভাঙ্গেতো ওকূল গড়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ব্রিটিশ বানিজ্যনীতির অবস্থাও হল অনেকটা সেই রকম। ইউরোপীয় ব্যাবসা বানিজ্যের বড়বাড়ন্ত ধরে রাখার জন্য এদেশেই আবার তৈরী করতে হল এজেন্সি হাউস। এশিয়ার জলপথে কাঁচামাল রফতানি এবং শিল্পজাত দ্রব্য আমদানির জন্য প্রয়োজন জাহাজ। সুতরাং সিপিং (seeping) এর কারবার অনিবার্য। ব্যবসায় প্রভূত মূলধন লাগে তাই ব্যঙ্ক ঋণ প্রয়োজন। জন্মনেয় ব্যাঙ্কিং ব্যাবসা। বানিজ্য তরীর সুরক্ষা ভাবনা থেকে আসে বীমা ব্যাবসা। এসবই চালান সম্ভব এজেন্সি হাউস মারফৎ। এই সব হাউসগুলি অধিকিন্তু দেশীয় রেশম থেকে রেশম শিল্প-বানিজ্য, উৎপাদিত নীল থেকে নীল শিল্প-বাণিজ্য ইত্যাদি বিয়য়েও সক্রিয় ছিল।

এই বিবিধ ব্যাবসাতে সাবলীলতা আনবার জন্য দেশীয় ব্যাক্তিদের সংযুক্তিকরণ আবিশ্যিক ছিল। কেননা এদেশের জল হাওয়া তারাই ভালো বুঝতেন। শিল্পের কাঁচা মালের বরাত কৃষকদের কাছে তাদের মাধ্যমেই পৌছেদেওয়া সম্ভব হত। মূল ব্যাবসার সহায়ক দ্রব্যের আশু ব্যবস্থা তারাই করে দিতে পারতেন। এছাড়া তাদের কুশলী ব্যবসায়ী বুদ্ধিও কাজে লাগত হাউস গুলির। এই সব দেশীয় ব্যক্তিগণ আসলে বাংলাদেশের ব্রাক্ষ্মণ, কায়স্ত, তেলী সম্প্রদায়ের করিৎকর্মা বাঙালি। এরা ইতিহাসে বেনিয়া নামে পরিচিত। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত কলকাতার বুকে এই রকম বেশ কয়েকজন বেনিয়ার আবির্ভাব ঘটেছিল যারা ব্রিটিশ তথা সওদাগরী ব্যাবসার গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। ১৮৫৫ সালের ক্যালকাটা কর্মাশিয়াল ডিরেক্টরীর হিসাব অনুযায়ী সংখ্যাটা তাদের ১৫০ এর বেশী। বস্তুত এখান থেকেই শুরু হয়েছিল বাঙালি ব্যাবসাবৃত্তির এক নতুন অধ্যায়, ইতিহাসের পাতায় যা

বেনিয়াবৃত্তি নামে চিহ্নিত।

এই বেনিয়াবৃত্তির নান্দিপাঠ শুরু হতে পারে যাকে দিয়ে তার নাম রামদুলাল সরকার। প্রকৃত নাম রামদুলাল দে (১৭৫২ – ১৮২৫) । যদিও তিনি ব্রিটিশ কম্পানির সাথে যুক্ত ছিলেন না। তার যোগ ছিল আমেরিকান মার্চেন্টদের সঙ্গে। আমেরিকানদের সিপিং ব্যাবসায় তার অংশীদারী ছিল। এছাড়া স্টক, শেয়ার এবং এস্টেটের ব্যাবসাতেও মূকধন বিনিয়োগ করেছিলেন। সমুদ্র বানিজ্যে তার কুশলতার জন্য আমেরিকানরা তাকে তাদের ব্যাবসার স্থায়ী সদস্য করে নিজেদের দেশে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। তার নামে একটি জাহাজের নামকরণও করেছিলেন তারা। সেই যুগে তার সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৩৩০১৪২৪.০০ টাকা।

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বেনিয়ার নাম মতিলাল শীল । (১৭৯২-১৮৫৪)। ইনি কর্ম জীবন শুরু করেছিলেন বীয়ার কম্পানির ছিপি সাপ্লাইয়ার হিসাবে। কালক্রমে নীল এবং রেশমের উতকর্ষতা বিষয়ে তার দক্ষতা ইউরোপীয় বণিক মহলে ছড়িয়ে পড়লে তাকে বিভিন্ন এজেন্সি হাউসগুলি বেনিয়া হিসাবে নিযুক্ত করে। যেমন- Fergussn Brothers & co ;Livingston Dearman & co; Mcleod, Fagan & co; Chapman & co; Tulloh & co; Ralli Mavrojani &co; Kelsall &co ইত্যাদি। এছাড়া Oswald Seal & co নামে তার নিজস্ব এজেন্সি হাউসও ছিল। তার ব্যক্তিগত পণ্যবাহী জাহাজ ছিল অন্তত তেরটি। মোটা ভাড়ার বিনিময়ে সেইগুলি সমুদ্রে ভাসতো। আটা কল, চিনি কল, নীল কুঠী সহ বিবিধ ব্যাবসায় তার মালিকানা ছিল।

আসাম কম্পানি লিমিটেডের' অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মতিলাল শীল। ভারতবর্ষের প্রথম বীমা কম্পানি 'Oriental Insurance Company'(১৮৩৪) স্থাপনেও তার গুরুত্ত্বপূর্ণ ভুমিকা ছিল। কিশোরীচাঁদ মিত্রের ভাষায় তিনি ছিলেন- 'Rothschild of Calcutta'।

এই পর্বের বণিক সমাজের কুলচূড়ামণি হিসাবে যাকে আখ্যাত করা হয়ে থাকে তিনি হলেন দ্বরকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬)। কেবল বঙ্গ তথা ভারতীয়দের মধ্যেই নয় এদেশের ইউরোপীয় ব্যাবসায়ী সমাজের মধ্যেও তার অবস্থান ছিল শীর্ষ স্থানীয়। ১৮৩৪ সালে উইলিয়ম কার নামে এক সাহেবের সঙ্গে জুটি বেঁধে তিনি 'Car , Tagore & Co' নামে একটি এজেন্সি হাউস খুলেছিলেন। এই হাউসের মুকুট শোভিত হয়েছিল যে যে ব্যাবসার পালকে তার তালিকাটি এই রূপ –

১। জাহাজ পরিবহণ ব্যাবসা

২। নীল কুঠী ক্রয় ও নীল নীল উৎপাদন

৩। রেশম নিষ্কাশন

৪। ডকিং

৫। চিনি কারখানা

৬। প্রকাশনা এবং মুদ্রণ ব্যাবসা

৭। মহাজনী ব্যাবসা

৮। বীমা ব্যাবসা

৯। আমানতি বা ব্যাঙ্কিং ব্যাবসা

১০। জমি কেনা বেচা

এক ব্যক্তির পক্ষে এত ধারার ব্যাবসাকে সফলভাবে আত্মস্থ করতে পারাটাই যেখানে আশ্চর্যজনক ঘটনা সেখানে দ্বারকানাথ তার কোম্পানিকে ব্যাবসায়ীক লেন দেনের মাপকাঠিতে সেই যুগে শীর্ষ স্থানে নিয়ে গিয়েছিলেন। যদিও উইলিয়ম কারের সঙ্গে তার সংযুক্তি ছিল কিন্তু গোটা ব্যবসার মূল হোতা ছিলেন তিনিই নিজেই। তার এই ব্যবসায়ী উদ্যোগের চরম নিদর্শন ছিল কয়লা খনি ক্রয়। তদানীন্তন ৭০,০০০.০০ টাকা বিনিয়োগ করে তিনি ১৮৩৬ সালের ২রা জানুয়ারী রানীগঞ্জের কলিয়ারী ক্রয় করেছিলেন। তার এই উদ্যোগের নেপথ্যে কেবল মুনাফা অর্জনের লক্ষ ছিল না, তিনি কয়লাখনি মারফৎ জ্বালানির সরবারহ করে এই দেশে রেল সহ বিভিন্ন বাষ্প ইঞ্জিন ব্যাবহারকে ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলেন। দেশকে আধুনিকতার পথে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে এ এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। তারই উৎসাহে রেল যোগাযোগ কলকাতা থেকে রানীগঞ্জ কোলিয়ারী পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছিল। এই বিষয়ে তিনি তার বন্ধু Theobald এর সাহায্য নিয়ে রেল ইঞ্জিনের জনক স্টিফেনসনকে সফলভাবে প্রভাবিত করে ছিলেন। সুতরাং বলাযায় The Great Western of Bengal Railway Company তারই উৎসাহ জাত প্রতিষ্ঠান। এবং আর এক প্রতিষ্ঠান The Union Bank; ব্যবসা বিকাশের জন্য অর্থের স্থায়ী প্রবাহ প্রয়োজন। তার এই অনুভব সমকালের বিত্তবান মহলে সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন বলেই এমন যুগান্তকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি নিজে ছিলেন এর ডিরেক্টর। এই ব্যাঙ্কের সহায়তায় কত যে দেশীয় পুজিঁপতি পায়ের তলায় শক্ত জমি পেয়েছিল তার হিসাব

নেই। এই সকল আর্থিক পদক্ষেপের মাধ্যমে দ্বারকানাথ এবং তার ‘কার টেগোর এন্ড কোং’ কেবল নিজস্ব পতিপত্তির বিকাশ ঘটিয়েছিলেন তাই না সেই সঙ্গে স্বদেশের বিশেষত বঙ্গ দেশের জন জীবনের মান উন্নয়নে বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করেছিলেন। যদিও দ্বারকানাথ তার ব্যাবসা শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারেননি। ১৮৪০ সালের পর থেকে তার ব্যাবসা পতনোন্মুখ হতে থাকে বিভিন্ন কারণে। কিন্তু বাঙালি উদ্যোগপতি হিসাবে তিনি যে কূশলতা সাফল্যের সঙ্গে দেখিয়ে গিয়েছিলেন তাতেই তিনি ভারতবর্ষের শিল্প-বাণিজ্যের ইতিহাসে নিঃসন্দহে একজন রোল মডেল বা আইকন রূপে চিহ্নিত হয়ে থাকবেন।

দ্বারকানাথ, মতিলাল, রামদুলাল দের তৈরী করা ব্যাবসা-ঐতিহ্যের পথ ধরে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এসেছিলেন আরো কিছু বাঙালি উদ্যোগপতি। যেমন--

রাজা দীগম্বর মিত্র- এই সমাজ সেবক, শিক্ষানুরাগী উদ্যোগপতি নীল এবং রেশম ব্যবসায় প্রভূত আর্থ করেছিলেন। শেয়ার ব্যাবসাতেও তার দক্ষতা ছিল। দ্বারকানাথ উত্তরকালে তিনিই একমাত্র উদ্যোগপতি যিনি ‘ওয়াটসন এন্ড কম্পানির মতন ইউরোপীয় কম্পানির সাথে প্রতিযোগিতা করে ভারতের বণিক মহলে নিজের স্থান স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

হরলাল শীল - মতিলাল শীলের এই সুযোগ্য পুত্র পিতার রেখে যাওয়া সম্পত্তি এবং বিবিধ ব্যবসার সঠিক পরিচালন ক্ষমতা দেখিয়ে হয়ে উঠেছিলেন সমকালের ব্যাবসাসায়ি মহলের সঠিক উত্তরসূরি।

এনারা ছাড়াও রামলাল ঘোষ, সূর্য কুমার ঠাকুর, ভোলানাথ চন্দ্র ইত্যাদি নামে আরও কিছু উদ্যোগপতির নাম নাম পাওয়া যাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাস ঘাটলে। এদের দ্বারকানাথ কিংবা ব্রিটিশ ব্যাবসায়ীদের মতন লম্বা পুঁজি ছিল না। কিন্তু উদ্যম ছিল ষোল আনা। স্বল্প পুঁজী সম্বল করেও কিভাবে বিদেশী অর্থ শক্তির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা যায় সেই কৌশল এরা জানতেন। সেই কারণেই গঙ্গা নদীর দুই পাশে ধূঁম উত্থিত চিমনির গায়ে কিংবা বঙ্গপোসাগরের কূলে পোত বন্দরে ভাসমান পণ্যবাহী জাহাজের মাস্তুলে ইউরপীয় কম্পানির ধারক বাহকগণের সাথে সাথে তাদের নামও খোদিত হয়ে থাকে।

তবে ভারতীয় উদ্যোগপতি সমাজের এই জৌলুস স্তিমিত হয়ে পড়েছিল ১৮৫০ সালের পর থেকেই। এই সময় বঙ্গ তথা ভারতের বাজারে দেখাদিয়েছিল আর্থিক মন্দা। বাঙালি ব্যবসাদের অর্থ লগ্নী সংস্থা হিসাবে কাজ করত যে ব্যঙ্ক সেই উনিয়ন ব্যঙ্ক ফেল করে গিয়েছিল ১৮৪৮ সালে। অন্য সব আর্থিক সংস্থাগুলির অবস্থাও

হয়েছিল সঙ্গিন। ইতিমধ্যে দ্বারকানাথের মতন অভিভাবকসুলভ ব্যক্তিত্বেরও মৃত্যু ঘটেছিল (আগোষ্ট, ১৮৪৬)। ফলে সংকট কালে নির্ভরতার হাত বাড়িয়ে দেবার মতন ধনিক আর ছিলেন না। তার উপরে দেশের সর্বপ্রান্তে রেল ব্যবস্থার উন্নতির ফলে বাণিজ্যে জল পথের প্রয়োজনীয়তা কমে গিয়েছিল। অথচ দেশীয় ব্যবসায়ীদের মূল মুনাফা আসত জাহাজ পণ্য পরিবহণের মাধ্যমে। এদিকে সুয়েজ খাল খুলে যাবার ফলে ইউরোপের সঙ্গে এদেশে প্রত্যক্ষ বাণিজ্য অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া বৈদ্যুতিক যোগাযোগ ব্যবস্থা বিকশিত হবার ফলে তার বা টেলি যোগে ব্যবসা সংক্রান্ত অনেক কাজ দ্রুত করে ফেলা সম্ভব হয়। এই ভাবে ইউরোপের সঙ্গে প্রত্যক্ষ এবং দ্রুত সংযোগের পথ তৈরী হওয়ায় সেই যুগের বেনিয়াদের দক্ষতা প্রদর্শনের জায়গাটা অনেকটাই খর্ব হয়ে যায়। কারণ তাদের পরিকল্পিত অনুমান শক্তিকে কাজে লাগাবার প্রয়োজনীয়তা এজেন্সি হাউস গুলির কাছে কমেযেতে থাকে। এর উপরে দেখা দিয়েছিল সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭)। সারা দেশব্যপী রাজনৈতিক অরাজগতা বাণিজ্যের পরিবেশ নষ্ট করেছিলো অনেকটাই। এছাড়া বাণিজ্যের উদ্যোগ নষ্ট হবার পশ্চাতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৫) একটা নেতিবাচক ভুমিকা পালন করেছিলো। এই ব্যবস্থার ফলে জমিদারী ক্রয় করে জমির খাজনা ভোগ করা যেত বংশানুক্রিম ভাবে। ফলে বিত্তবানদের কাছে প্রায় বিনা পরিশ্রমে নিরাপদ আর্থিক সংস্থানের সুজোগ চলে এল। এই বিষয়ে ‘সংবাদ পূর্ণচন্দ্র’ পত্রিকার পাতাতে উঠে এসেছিলো চমৎকার গঠনমূলক পর্যবেক্ষণ-

If our countrymen start their own business enterprise, then they can live an independent life. Few of our brothers understood this and started their own business ventures. But general trend are not very encouraging. Actually in business, the entire risk relies on the investor. So our Bengali friends are afraid to take such risk.They hand over their wealth to the Europeans and secure the head clerkship in those European firms. Although a few people have sufficient money to start their own Business enterprise, due to lack of stamina they are unable to take such steps.

তাছাড়া ইউরোপীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রভাবে শহর কেন্দ্রিক সচ্ছল পরিবারের মধ্যে পাশ্চাত্ত্ব শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। তাদেরর জীবনের লক্ষ্য ব্যবসা থেকে

বদলে সরকারী আধিকারীক বৃত্তিতে পরিবর্তিত হয়। ব্যবসা তখন Low Status symbol হিসাবে বিবেচিত। এমনকি সেই পরিবেশে ব্যবসার চাইতে সরকারী কেরানীবৃত্তিকেও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয়। গ্রহণযোগ্য ব্যবসা বলতে তারা তখন শুধু বুঝতেন আইন ব্যবসা। বড়জোর পত্রিকা সম্পাদনা। এইগুলিই ছিলো বাঙালির Status symbol এবং ভদ্রলোক ভেলু। এই কারণে দ্বারকানাথ, মতিলালদের তৈরীকরা উত্তরাধিকার গ্রহণের দ্বায়িত্ব সেই যুগের আর্থিক সক্ষম বাঙালিরা নিতে চাইলেন না। সেই শূণ্য জমি দখল নিয়েছিল ব্রিটিশ ইন্ডাস্ট্রি। প্রশাসনের অনুকুল বাতাস পেয়ে উড়তে লেগেছিল ইউরোপীয় শিল্প-বানিজ্যের নিশান। এভাবেই আষ্টাদশ শতকে জাগরিত বেনিয়া সমাজের উত্তরধারা ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের আর্থ-সমাজ বালুকার তলায় চাপা পড়ে শুকিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু এইরূপ চাকুরী নামক পরজীবী অর্থব্যবস্থা ভদ্রলোক বাঙালিকে খুব একটা যে স্বস্তিতে রেখেছিলো ইতিহাস তা বলে না। কারণ এই ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ পরিসরে প্রয়োজনাতিরিক্ত আমদানি অবশ্যাম্ভাবী ছিলো। বাস্তবে দেখাও গেলো তাই। প্রার্থীর অতি প্রতুলতায় চাকুরীর সম্ভাবনা হল সঙ্কুচিত এবং বেতনের পরিমান গেল কমে। তাছাড়া এই চাকুরীবৃত্তি পরাধীন বাঙালিকে পরনির্ভরশীল শ্রেনিতে নামিয়ে এনেছিলো। ফলে বাইরে ‘ভদ্রলোক বাবু’ হলেও আদতে ব্রটিশদের কাছে তাদের পরিচয় ছিলো savage nigger.

বাঙালির এই হেন সামাজিক এবং আর্থিক অধঃপতন অনুধাবন করে পীড়িত হয়েছিলেন সেই যুগের অনেক মননশীল ব্যক্তিত্ব। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলো পরাধীনতার যন্ত্রণা। তারা বুঝতে পরেছিলেন এই দুরাবস্থা ঘোচাতে গেলে ব্রিটিশ অধীনতা থেকে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক যুগপৎ মুক্তি চাই। চাই একদিকে বৈপ্লবিক আন্দোলন অন্যদিকে স্বাধীন ব্যবসা। দ্বারকানাথ–মতিলাল শীলদের সময়কার বেনিয়াবৃত্তির পুনরুজ্জীবন আর সম্ভব নয়, কিন্তু দেশীয় উদ্যোগে স্বদেশী শিল্পের এবং বাণিজ্যের উদ্ভাবন হয়তো সম্ভব। এই ভাবনাকে বাস্তম্বায়িত করবার জন্য উদ্যম এবং উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন কোন কোন দেশপ্রাণ বাঙালি। তারাই বাংলা দেশের পরিপ্রেক্ষিতে জন্মদিয়েছিলেন ব্রিটিশ ব্যবসা বাণিজ্যের সমান্তরাল এক অর্থনৈতিক বৃত্তি যা স্বদেশী উদ্যোগ নামে ইতিহাসে পরিচিত।

এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম আলোচনাতে আসে দুইজন স্বদেশী উদ্যোগপতির নাম নবগোপাল মিত্র এবং রাজনারায়ন বসু। যদিও এনারা কোন উল্লেখযোগ্য প্রত্যক্ষ

বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু তারা আয়োজন করেছিলেন ‘হিন্দু মেলা’ নামক একটি স্বদেশী সমাবেশ। ১৮৬৭ খ্রীঃ থেকে পরবর্তী চোদ্দ বছর এই বাৎসরিক মেলায় স্বদেশী সংস্কৃতির পাশাপাশি স্বদেশী পণ্যসামগ্রির বাণিজ্যিক ব্যবহার এবং স্বদেশী শিল্পের কার্যকারিতা সম্পর্কিত চর্চা হত। পাশাপাশি ছিলো জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির স্বদেশী উদ্যোগ। এইবাড়ি থেকে প্রকাশিত ‘ভারতী’পত্রিকাতে নিয়ম করে স্বদেশী ব্যবসাতে উৎসাহ প্রদান চলত। ঠাকুর বাড়ির সদস্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর একাধিক বাণিজ্যের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। যদিও তিনি সফল হতে পারেননি। কিন্তু সমকালের এইসকল উদ্যোগ ব্যর্থ হয় নি। কারণ এই আবহের মধ্যেই আমরা কয়েক জন স্বদেশী উদ্যোগপতিকে পেয়ে যাই যারা সফল ভাবে বাঙালির স্বাধীন ব্যাবসা বৃত্তির পুনর্জাগরণ ঘটাতে পেরেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর সীমাবদ্ধ পরিসরের এই বিষয়ে আমরা কেবলমাত্র তিনজন উদ্যোগপতির সম্পর্কেই আলোকপাত করতে পারছি।

প্রথম জনের নাম হেমেন্দ্র মোহন বসু। ১৮৯৪ সালে পারফিউম তৈরীর কারখানা দিয়ে তার উদ্যোগের সূত্রপাত। এর পরে একে একে তার ব্যবসার মুকুটে সংযুক্ত হয়েছিলো বেশ কয়েকটি পালক– কুন্তলীন নামে সুগন্ধী তেল তৈরীর কারখানা, ফটোগ্রাফিক ব্যবসা– the talking machine hall, সাউন্ড রেকর্ড কম্পানি, অটোমবাইল ডিস্ট্রিবুটর ইত্যাদি। তার উদ্ভাবনী শক্তি এবং সহজাত ব্যবসায়ী বুদ্ধি প্রতিটি কোম্পানিকে সেই যুগে এলিট মর্যাদায় উন্নিত করেছিলো।

দ্বিতীয় উদ্যোগপতি হিসাবে যাকে আমরা পাচ্ছি তিনি হলেন P.M Bagchi & co এর প্রতিষ্ঠাতা কিশোরী মোহন বাগচী। ১৮৮৩ খ্রীঃ ‘দর্জিপাড়া ক্যামিক্যাল এন্ড রাবার স্টাম্প ওয়ার্কস’ নাম দিয়ে এই কম্পানির যাত্রা শুরু। বাগচী মহাশয় রসায়ন জ্ঞান, শিল্পী মন এবং ব্যবসারী বুদ্ধির সুষম মিশ্রণ দিয়ে একে সাফল্যের শীর্ষে নিয়ে যেতে বেশি দিন ব্যয় করেননি। কালি ও স্ট্যাম্প ছাড়াও পারফিউম এবং সিরাপের কারখানা চলত P.M Bagchi & co এর নামে। এই কোম্পানির উৎপাদনে প্রয়োজনীয় সহযোগী সামগ্রী সংগৃহীত হত বিভিন্ন স্বদেশী কোম্পানিগুলি থেকে।

এর পরে আসে বিখ্যাত Bengal chemical and Pharmaceutical কম্পানির প্রতিষ্ঠাতা ততধিক বিখ্যাত বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের নাম। জ্ঞান এবং শিল্প উদ্যোগের মেল বন্ধন কত নিবিড় হতে পারে এবং সেই নিবিড়তা জাতীর জীবনে কতদূর ফলপ্রসূ হতেপারে আচার্য রায় এবং তার কম্পানি তার বিশিষ্ট নির্দশন।

১৮৯২ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত এই কোম্পানি শুধু যে জীবন দায়ী ঔষধের যোগান দিয়ে ব্যধিগ্রস্ত মানুষের জীবন যুদ্ধের শরিক হয়েছিলো তাই না বহু স্বদেশীর কর্ম সংস্থানেরও বন্দোবস্ত করতে পেরেছিলো। ঔষধ প্রস্তুতের পাশা পাশি এই কোম্পানি ল্যাবরেটরী সামগ্রী প্রস্তুত করে রসায়ন গবেষণায় অমূল্য অবদান রেখেছিলো।

ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বদেশী উদ্যোগের যুগে এই তিন উদ্যোগপতির বিশিষ্ট উদ্যোগ ছাড়াও আমরা আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ উদ্যোগের সন্ধান পাব, সেই টি হল Bengal Providential Railway Company.এই কোম্পানিটি কয়েক জন দেশীয় জমিদারের অর্থানুকূল্যে তৈরী করেছিলেন আনন্দ প্রসাদ রায় এবং অমৃতলাল রায়। ১৮৮৪ সালে হাওড়া থেকে তারকেশ্বর প্রসারিত রেললাইন এই কোম্পানিরই একটি সফল প্রচেষ্টা। গঙ্গার পশ্চিম পারে রেলওয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থায় এই কোম্পানির অবদান চিরস্মরণীয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর উদ্যোগপতিদের বিনিয়োগ করা বীজ থেকে মহীরুহের সৃষ্টি হয়েছিলো পরের শতাব্দীতে। এদের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিলো আরো কিছু স্বদেশী উদ্যোগপতি। তৈরী হয়েছিলো বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষে স্বদেশী বাণিজ্যের এক সমান্তরাল ধারা। কিন্তু তাই বলে এটা মনে করার কোন কারণ নেই যে এই স্বদেশী উদ্যোগের হাত ধরে বাঙালি তার ব্যাবসা-বানিজ্যবৃত্তির হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলো। তা আর সম্ভব হয়নি। বাঙালির মজ্জাতে যে ভদ্রলোকের নিরাপদ রুজি নামক চাকুরীবৃত্তির ভাবনা প্রবিষ্ট হয়েছিলো তা স্বদেশী উদ্যোগের ঝাঁকুনিতেও ঝড়ে পড়ে নি। ফলে বৃহদাংশ বাঙালির ব্যবসা বিমুখতা বঙ্গদেশের শিল্প বাণিজ্যের যে শূন্য জমি তৈরী করে দিয়েছিলো ব্রিটিশরা চলে যাবার কালে তার দখল নিয়ে ছিলো মারোয়ারী গুজরাটি সমাজ। ফলে ব্রিটিশদের পরে বাঙালি সমাজের অর্থ-সম্পদের মালিকানা চলে যায় পশ্চিমী কোটিপতিদের হাতে। আর ভদ্র চাকুরী সর্বস্ব বাঙালি থেকেগেল তাদের মুনাফা লাভের সফল কারিগর হিসাবে।

ঋণ স্বীকার:

১। *Bengali Entrepreneurs and Western Technology in the Nineteenth Century : A social Perspective* – Suvobrata Sarkar

২। *বাংলার ব্যবসা ও প্রিন্স দ্বারকানাথ* – ল্যাডলীমোহন রায়চৌধুরী – দেশ সাহিত্য পত্রিকা

৩। উইকিপিডিয়া